বাংলা কাব্য-কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) আবির্ভাব এমন এক সন্ধিক্ষণে হয়েছিল, যখন আধুনিক বাংলা কবিতার জন্ম হচ্ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময়কালে বাংলা সাহিত্য ছিল মূলত সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে আচ্ছন্ন। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রামপ্রসাদ সেনের মতো কবিদের ধারা তখনও ক্ষীণভাবে প্রবাহিত ছিল, কিন্তু নতুন যুগের উপযোগী কোনো শক্তিশালী কাব্যধারার উদ্ভব হয়নি। এই সময়েই তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে বাংলা কাব্যে এক নতুন দিকনির্দেশনা দেন। তিনি একদিকে যেমন প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তেমনই অন্যদিকে নতুন যুগের আধুনিকতাকে গ্রহণ করার চেষ্টা করেন।

রচিত গ্রন্থসমূহ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,

- প্রবোধ প্রভাকর
- হিত প্রভাকর
- বোধেন্দ্র বিকাশ
- রামপ্রসাদ সেনের জীবনচরিত ও পদাবলী
- ভারতচন্দ্রের জীবনচরিত ও পদাবলী
- কাব্য সংগ্রহ (মৃত্যুর পর তাঁর কবিতাগুলো একত্রিত করে প্রকাশিত হয়)

সামাজিক ব্যঙ্গ ও কৌতুক

তাঁর কবিতায় সমকালীন সমাজের নানা অসঙ্গতি, কুসংস্কার, ভণ্ডামি এবং ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের কৃত্রিমতা তীব্র ব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর শ্লেষাত্মক কৌতুকপ্রিয়তা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারা নিয়ে আসে।

স্বদেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ

তিনি বিদেশি শাসনের অধীনে থাকা দেশের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন এবং স্বদেশপ্রেমের আদর্শকে তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন।

প্রকৃতি ও সাধারণ জীবন

তাঁর কবিতায় বাংলার প্রকৃতি এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সরল চিত্রও স্থান পেয়েছে। তাঁর কবিতায় তিনি দেশীয় ফল, ফুল, পাখিদের নিয়েও লিখেছেন, যা তৎকালীন কাব্যে বিরল ছিল।

অবদান

মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সংযোগ

তিনি বাংলা কাব্যকে মধ্যযুগের পদ্যরীতি থেকে আধুনিক যুগের গদ্যরীতির দিকে নিয়ে যাওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁকে সন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়, কারণ তাঁর কাব্যে প্রাচীন ও আধুনিক রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়।

সামাজিক বিষয়কে কাব্যের অঙ্গীভূতকরণ

তিনি প্রথম কবিদের মধ্যে অন্যতম, যিনি কাব্যকে নিছক ধর্মীয় বা পৌরাণিক বিষয় থেকে বের করে এনে সমকালীন সমাজ, রাজনীতি, এবং দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেন,

"মিছা কেন কুল নিয়া কর আঁটাআঁটি।
এ যে কুল কুল নয় সার মাত্র আঁটি।।
কুলের গৌরব কর কোন্ অভিমানে।
মূলের হইলে দোষ কেবা তারে মানে।।"

এই উদ্ধৃতিতে তিনি বাঙালি সমাজের কৌলীন্য প্রথাকে তুলে ধরেছেন, যা তৎকালীন কাব্যধারায় বিরল ছিল।

শ্লেষ ও ব্যঙ্গের প্রয়োগ

তাঁর শ্লেষাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলো তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। এটি বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ও ব্যঙ্গাত্মক রচনার ধারাকে প্রতিষ্ঠা করে,

"যত পার, কর জ্ঞান,
ইংরেজি ভাষা শেখ, দেশি জ্ঞান দেশি কথা,
নাহি তিল মাত্র দেখ। আচারে বিচারে ভ্রংশ,
সকলি হয়েছে নষ্ট, যত কিছু গুণ আছে,
সকলি হয়েছে কস্ট।"

এই ব্যঙ্গাত্মক পঙ্‌ক্তিটি ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের ঐতিহ্যকে ত্যাগ করে পাশ্চাত্য রীতিনীতি গ্রহণের প্রবণতাকে তুলে ধরেছে।

সাংবাদিকতার সঙ্গে সাহিত্যের মেলবন্ধন

তিনি তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার মাধ্যমে কবিতা এবং সাহিত্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন, যা বাংলা সাহিত্যে সাংবাদিকতার গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলে।

"এক হাতে মোদের কবিতা, এক হাতে সংবাদ,
এভাবেই চালাব বাঙালির ভবিষ্যৎ।"

এই উদ্ধৃতিতে তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে সমাজকে শিক্ষিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

সংক্ষেপে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা কাব্যে এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। তিনি প্রাচীন রীতি থেকে আধুনিকতার দিকে উত্তরণের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসেবে কাজ করেছেন।